সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু: 'প্রগতি', 'কবিতা'র দু-চার কথা

জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা

ধনঞ্জয় ঘোষাল

> যা প্রকৃত সাহিত্য তা কখনো জন সাধারণের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার প্রয়োজন হ'তে পারে না; অপরপক্ষে জন সাধারণকে উক্ত সাহিত্যের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা একান্ত দরকার, সাধারণ লোকে যদি উঁচুদরের রসসৃষ্টির মর্ম গ্রহণ করতে না পারে, তবে সে দুঃখ ও লজ্জা লোকেরই এবং তা নির্ধারণের একমাত্র উপায় হচ্ছে -উক্ত সৃষ্টিকে গাল দেওয়া নয় - তা বোঝবার মত জ্ঞান ও রসবোধ অর্জন করা।

উপরের কথাগুলো যখন ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে বুদ্ধদেব বসু লিখছেন তখন তিনি বয়সে তরুণ এবং আত্মপ্রকাশ পর্বে রয়েছেন। তখনো জন্ম হয়নি 'কবিতা' পত্রিকার। ঠিক সেই সময়টায় বাংলা পত্র - পত্রিকার দিকে চোখ রাখলে দেখা যায়। বুদ্ধদেব বসু রুচিশীল পত্রিকা বলতে উপযুক্ত মনে করেছেন প্রথম চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' কে। রামানন্দ সম্পাদিত 'প্রবাসী', জলধর সেন সম্পাদিত 'ভারতবর্ষ, প্রথম চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজ পত্র' দীনেশ রঞ্জন সম্পাদিত 'কল্লোল' ইত্যাদি পত্রিকাগুলি তখন বাংলা সাহিত্যে মুখ্য কাগজ বলে বিবেচিত। এছাড়াও ছিল আরও কিছু পত্র - পত্রিকা যেগুলি সাহিত্য সমাজের মূল স্রোতের ধারা হিসাবেও বিবেচিত হয়েছিল।

বুদ্ধদেব বসু যখন উপরের কথা গুলো লিখছেন তখন প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজ পত্র'র প্রায় শেষ অবস্থা। পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় বার হয় দুটি পর্যায়ে। বৈশাখ ১৩২১ -বৈশাখ ১৩২৯ এবং ভাদ্র ১৩৩২ - ভাদ্র ১৩৩৪ এই পর্যায়ে অল্প আয়ুর ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল 'সবুজ পত্র'।

বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন : ...শ্রীযুক্ত প্রথম চৌধুরী ছাড়া উন্নত ও মার্জিত রুচি অনুযায়ী সম্পূর্ণ সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা চালাতে বাংলাদেশে আর কেউই কোনোদিন চেষ্টা করেননি। বরঞ্চ অনেক সম্পাদক এখনও জনসাধারণের এই অনুন্নত রস ও রুচিবোধের খোরাক জোগাতে বিশেষ ব্যস্ত বলেই মনে হয়। এই ছোট মনকে খুশি রাখবার জন্যেই 'শনিবারের চিঠি' সাহিত্যকে এমন একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতর বেঁধে রাখতে উৎসুক...'।

মাত্র কয়েক অনুভব থেকেই বুদ্ধদেব বসুর সাময়িক পত্র - পত্রিকা বিষয়ক কিছু চিন্তাভাবনা প্রকাশ পায় এবং দেখা যায় বুদ্ধদেব বসু শনিবারের চিঠির মতো জনপ্রিয় পত্রিকাকে ফেলে রেখে সামনে এনেছেন সবুজ পত্রকে। অর্থাৎ রুচিগত ব্যাপারে বুদ্ধদেব বসু হালকাভাবে নিজেকে মেলে ধরতে নারাজ। সাহিত্য বোঝার জন্যে যে পাঠক সমাজকেও শিক্ষিত হতে হবে এ ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং পাশাপাশি পাঠক সমাজ তৈরির দায়টিও নিতে হবে সমকালের সাহিত্যিক ও 'পত্র - পত্রিকাকে।

তরুণ বয়সে যে যুবক এই কথাগুলি সমসাময়িক পত্র -পত্রিকা বিষয়ে উপলব্ধি করেন, তিনি পত্রিকা সম্পাদনা করবেন না তা হয় কখনো? শৈশবেও বুদ্ধদেব 'বিকাশ' ও 'পতাকা' নামক হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, যার সম্পাদক শুধু নয় তিনি ছিলেন প্রধান লেখক, লিপিকার এমনকী যাবতীয় কিছু দায়িত্বের প্রধান।

হাতে লেখা পত্রিকা হিসাবে বুদ্ধদেব বসুর অন্যতম আত্মপ্রকাশ 'প্রগতি' পত্রিকায়। তরুণ বয়সে একেবারে ঊনিশের যুবক বুদ্ধদেব তখনও আই.এ পাশ করেননি, হাতে - লেখা পত্রিকা দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, 'প্রগতি'। আই. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন বুদ্ধদেব এবং এই জন্যই মাসিক কুড়ি টাকা স্কলারশিপও পাওয়া গেল। তখন মাথার মধ্যে চিন্তা আসে প্রগতিকে ছাপা অক্ষরে প্রকাশ করতে হবে। একশো টাকা হলেই কাগজ বেরোবে, সুতরাং মাসে দশ টাকা করে দেবে দশজন।

বুদ্ধদেবের সঙ্গে অজিত দত্তের পরিচয় অনেক আগেই এবং তাদের মধ্যে নিভৃতে সাহিত্যচর্চা চলতো। 'প্রগতি' মুদ্রিত আকারে প্রকাশ পর্বে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে প্রগতি-র যুগ্ম-সম্পাদক থাকলেন অজিতকুমার দত্ত। প্রগতির জন্ম হল ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে আষাঢ়ে 'কল্লোল' পত্রিকার ভাদ্র ১৩৩৪ সংখ্যায় 'প্রগতি' প্রকাশের বিজ্ঞাপনও দেওয়া হল। প্রগতি-র কার্যালয় ছিল ৪৭ নং পুরানো পল্টন, ঢাকা।

দেখা যায় উপরের কথাগুলি যখন বুদ্ধদেব বসু ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে লিখেছেন তখন তিনি প্রগতি-র সম্পাদক হয়ে উঠেছেন এবং মনের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন যে সম্পাদক হিসাবে বাঙালি পাঠকসমাজকে তিনি কী দিতে চান বা নতুন পাঠকসমাজ নির্মাণে তাঁর দায় কতখানি। আর্থিক অনটনের ভিতর দিয়ে 'প্রগতি' চলতে থাকে। বিনোদনের জন্য নিছক পত্রিকা প্রকাশ যে 'প্রগতি'র লক্ষ্য নয় তা সুনিশ্চিত হয়েছিল। উনিশ বছরের দৃপ্ত তরুণের চোখের স্বপ্ন ছিল এই রকম, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত লিখেছেন:

> .....তোমার কাছ থেকে 'প্রগতি' যে স্নেহ ও সহায়তা পেল তার তুলনা নেই। এই ব্যাপারে আমরা কত নিঃস্ব ও নিঃসহায় ভেবে ভেবে এক এক সময় আশ্চর্য লাগে। লাভের মধ্যে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন দুশ্চিন্তা, প্রচুর আর্থিক ক্ষতি ও আরো প্রচুর লোকনিন্দা একটি লোক নেই যে সত্যি সত্যি আমাদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। ...খেয়ে - পরে - ঘুমিয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারব না, বিধাতা আমাদের এ অভিশাপ দিয়েছেন। তাই একটা কিছু করতে হয়। কোনো একটা নেশায় নিজেদের ডুবিয়ে রাখতে হয়। ...হাত একেবারে রিক্ত-কি করে চলবে জানিনে। তবু আশা ছাড়িনে। তবু দমে যাই না। কেমন যেন বিশ্বাস জন্মেছে যে প্রগতি চলবেই - যেহুতু চলাটা আমাদের পক্ষে দরকার।

প্রগতি - স্বপ্ন নিয়ে যে চলা তরুণ বয়সে বুদ্ধদেব শুরু করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। আর্থিক অনটনে 'প্রগতি' বন্ধ হয়ে যায় একসময়। বিভিন্ন সময়ে বন্ধ হয়ে যাবে এমন আশঙ্কা ছিল। শনিবারের চিঠি-তে 'প্রগতি'র মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে বারবার। তির্যক মন্তব্য, নিন্দা সমালোচনা মুখর হতে হয়েছে প্রগতি - কামীদের। বুদ্ধদেব চিঠি লিখছেন:

> প্রগতি তুলে দিলাম। অসম্ভব। ...আমার ইহকাল -পরকালে, অন্তরে বাইরে, বাক্যে- মনে আর আপনার বলে কিছু রইল না। কত আশা নিয়ে যে শুরু করেছিলাম, কত উচ্চাভিলাষ, স্নেহ, আনন্দ-কী একান্ত idealism যে এর পেছনে ছিল। ...অত্যন্ত প্রিয়জনও দীর্ঘকাল বিষম রোগে ভুগলে যেমন তার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় হয়ে ওঠে, 'প্রগতি' — ও শেষের দিকে তেমনি অসহ্য হয়ে উঠেছিল। প্রগতির মৃত্যু সংবাদ ব্রডকাস্ট করে দিও।

তরুণ বয়সে স্বপ্ন কীভাবে তৈরি হয়, কীভাবে ভেঙে যায় এবং কী মানসিক যন্ত্রনায় পড়তে হয় এই সব মানুষদের, তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ বুদ্ধদেব বসুর তরুণ বয়সের সম্পাদনার মুহূর্তগুলি। বুদ্ধদেবের তরুণ বয়সের স্বপ্ন-প্রগতির আয়ু মাত্র দু-বছর, ১৯২৭-২৯ পর্যন্ত।

কিন্তু ইচ্ছেপূরণের একটা আকাঙ্ক্ষা থেকে গেল ভিতরে। বোধহয় প্রগতি-র বন্ধ হয়ে যাওয়াটা সেই উদ্যমতাকে ভিতরে ভিতরে আরও বেশি দৃঢ় ও সাবালক করে তুলেছিল। 'প্রগতি' প্রকাশের ক্ষেত্রে যে তিক্ততা, যে অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল ভিতরে

ভিতর সেই তিক্ততাবোধ ও কষ্টসহিষ্ণুতাই বুদ্ধদেবের ভিতরে নতুন শক্তির অঙ্কুরোদগম ঘটায় এবং প্রগতি - পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবার ছ-সাত বছরের মধ্যেই তার ভ্রূণ প্রকাশ হয়ে পড়ে।

১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হল 'কবিতা' - পত্রিকা। ত্রৈমাসিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম দু-বছরের সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সহকারী সম্পাদক সমর সেন।

'প্রগতি' বন্ধ হয়ে যাবার পর বুদ্ধদেব যখন 'কবিতা' পত্রিকা সম্পাদনা করতে এলেন তখন তিনি ২৭ বছরের যুবক, প্রেমেন্দ্র মিত্র তিরিশ পেরিয়েছেন সবে এবং সমর সেন উনিশের তরুণ যে বয়সে বুদ্ধদেব এগিয়ে এসেছিলেন 'প্রগতি'-র দায়িত্ব নিয়ে। তিনজনে হলেও 'কবিতা' পত্রিকার প্রাণবিন্দু ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। ব্যক্তিগতভাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার অনুরাগী ছিলেন বুদ্ধদেব এবং তরুণ কবি সমর সেনের মধ্যে সম্ভাবনা দেখেছিলেন বলে তাঁদের যুক্ত করেছিলেন পত্রিকার সঙ্গে।

দ্বিতীয় বর্ষে 'কবিতা পত্রিকা থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিন্ন হন। বুদ্ধদেব এই বিছিন্নতা প্রসঙ্গে বলেছেন : বালিগঞ্জ, ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিন্যু ঠিকানায় 'কবিতা' যখন বদলি হলো তখনও তার দু-বছর বয়স পেরোয়নি, কিন্তু এর মধ্যেই আবহাওয়া অনেকটা বদলে গিয়েছিল। প্রেমেনের আর উৎসাহ নেই- বোধ হয় সেই সময়ই তার সিনেমা সংস্রব শুরু...।

প্রগতি ও কবিতা এই দুই পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে বুদ্ধদেবের বয়সের ও চিন্তার খানিকটা তফাৎ ঘটেছিল। 'প্রগতি' যখন ১৯২৭-এ প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ মধ্যগগনে। সমস্ত পত্র - পত্রিকাই চাইতো নিজ উৎসাহে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বা রবীন্দ্রনাথের লেখা পাওয়া ছিল ভীষণ একটা উৎসাহের ঘটনা। কিন্তু প্রগতি প্রকাশের ক্ষেত্রে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করেই প্রগতির যাত্রা শুরু হয়। রবীন্দ্র - পরিহার করার সময়টাতেই হয়তো বুদ্ধদেব নিজের ভিতরে একটা প্রস্তুতি নিয়েছিলেন যে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে একটা নিজস্বতা রক্ষার দায় রাখা উচিৎ।

'কবিতা'-র প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই দেখা যায় কবিতা ও গদ্য দুই ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের প্রবল উপস্থিতি। 'কবিতা' প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথকে পত্রিকা পাঠালেন বুদ্ধদেব। রবীন্দ্রনাথকে বুদ্ধদেব জানিয়েছিলেন, -'পুনশ্চয়ে আপনি যে ছন্দের প্রবর্তন করেছেন, তা বিভিন্ন কবির হাতে বিভিন্ন রূপ নিয়ে বাঙলা কবিতায় স্থায়ী হতে চলেছে বলে মনে হয়।'

এই চিঠির উত্তরে, রবীন্দ্রনাথ দায়সারাভাবে কোনো মন্তব্য না লিখে দীর্ঘ পত্রে 'গদ্য কবিতা' বিষয়ে মত এবং প্রথম সংখ্যা কেমন হয়েছে জানালেন। কবিতা-র দ্বিতীয় সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে ছাপা হয়েঠিল সেই চিঠিখানি। সেই সময়ে লেখালিখি কোন ধারা কী পর্যায়ে এবং কীভাবে যুগের মূল ধারা হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে এ নিয়ে বুদ্ধদেবের নিজস্ব একটা মতামত ছিল। রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি যে বুদ্ধদেবকে উৎসাহ জোগায় তা বলাবাহুল্য।

'কবিতা'-র পাতায় বুদ্ধদেব বসুর রচনায় একটি বিশেষ অংশ জুড়ে ছিল রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা পর্ব। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর ব্যক্তিগত মতামত উল্লেখ এ প্রসঙ্গে অমূলক হবে না। বুদ্ধদেব 'বাঙলা পদ্যের নব - জন্ম' রচনায় বলছেন :

> 'শেষের কবিতা'র ভাষা প্রায় ইংরিজির মতই সহজ, flexible;-সে ভাষায় প্রকাশ করা না যায়, এমন কোনো ভাব নেই; যে, ভাষা সহজ, ... 'শেষের কবিতা' পড়বার পর মনে হয়, এতদিনে বাঙালীরা কি করে কোনো কথা লিখতে পেরেছে? 'শেষের কবিতার সঙ্গে সঙ্গে যে নতুন গদ্য জন্মগ্রহণ করলো, তা-ই হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর বাঙলা গদ্য। তা অতি আধুনিক। 'সবুজ পত্র' বাঙলা গদ্যের ক্রমবিকাশে একটি Landamark 'শেষের কবিতা' আর-একটি। যেটা ছিলো সাহিত্যে কথ্যভাষার প্রতিষ্ঠা, এটা হচ্ছে কথ্য ভষার একটি নতুন সাহিত্যিক রূপ স্থাপন।

বলাবাহুল্য যে উক্তি দিয়ে এ রচনার সূত্রপাত ঘটনা হয়েছিল তাতে বুদ্ধদেবের 'সবুজ পত্র' এর প্রতি যে মুগ্ধতা ছিল, রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে ফিরে এলো সেই মুগ্ধ উচ্চারন কথাও। রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেবের ও 'কবিতা' পত্রিকা এ নিয়ে গবেষণার বিষয় হতে পারে। কিন্তু সম্পাদক বুদ্ধদেব যে 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ করলেন রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ পেয়ে তা এগিয়ে চলল প্রবল গতিতে।

'কবিতা' পত্রিকার সঙ্গে বা সেই সময়ের কবিকুলের ভিতর পারস্পরিক সম্পর্ক মাঝেমাঝেই ক্ষুন্ন হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে। মাঝে মাঝেই একে অপরকে অপছন্দ করেছেন এবং প্রকাশ্যে সোচ্চার হতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। 'কবিতা'র নিয়মিত লেখকের ভিতর একে অপরের প্রতি অপছন্দতা কবিতাতেও ফুটে উঠেছে। 'বদ্যিনাথও পদ্য লেখে' ব্যঙ্গ কবিতার উপলক্ষ্য যে বিষ্ণু দে এবং ব্যঙ্গ কবিতাটির রচয়িতা অজিত দত্ত এ অনুমান এখন সর্বজনস্বীকৃত কাব্যজগতের দর্শনকে কেন্দ্র করেই মতভেদ ঘটেছে। বুদ্ধদেবের মত - পার্থক্য দেখা গেছে অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে। মতভেদ ফুটে উঠেছে বিষ্ণু দে-র সঙ্গেও। কিন্তু এই মতভেদকে কেন্দ্র করে কোনো স্থায়ী এ সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা নিয়ে কবিতা দূরত্ব তৈরী করেননি সম্পাদক বুদ্ধদেব। ভালো কবিতা প্রকাশের জন্য ব্যক্তিগত মতভেদকে দূরে রেখেই তিনি সম্পাদনা করেছেন নতুন কবিদের খেয়াপারাপারের কবিতাকে।

এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই এসে পড়ে জীবনানন্দের নাম। সুধীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ পারস্পারিক কবিতা বিষয়ে হয়তো খানিকটা উদাসীন ছিলেন কিন্তু মধ্যবর্তী সংযোগ রেখাটি বোধহয় সম্পাদক বুদ্ধদেব, কারণ— তিনি উভয়ের কবিতার অনুরাগী। 'প্রগতি' পত্রিকা সম্পাদনার সময় থেকেই জীবনানন্দকে আত্মপ্রকাশ করানোর ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের একটা ভূমিকা ছিল। বুদ্ধদেব বসু 'আমার যৌবন' -এ লিখছেন : সেই দূর সময়ে, যখন 'গন্ডার কবি'কে নিয়ে রোল উঠেছিল অট্টহাসির, অন্য কোথাও সমর্থনসূচক প্রয়াস ছিল না, তখন সেই ক্ষুদ্র মঞ্চটিতেই প্রথম সংবর্ধিত হন জীবনানন্দ - প্রকাশ্যে একক কণ্ঠে, সোচ্চার ঘোষণায়।

সকলালের কবিদের নিয়ে নাম বলার ক্ষেত্রে একটা সময়ের পরে দেখা গেল 'কবিতা' পত্রিকার ভিতর দিয়েই অনেক কবিই খ্যাতি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ধাপটি উত্তীর্ণ হলেন তাদের কাব্যগ্রন্থ নিয়ে বুদ্ধদেব নিবিষ্ট আলোচনায়। সুধীন্দ্রনাথের 'ক্রন্দসী', বিষ্ণু দের 'চোরাবালি', অমিয় চক্রবর্ত্তীর 'খসড়া', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রন্থের বুদ্ধদেবকৃত আলোচনায় যেমন 'কবিতা' সমৃদ্ধ হয়েছে, তেমনি সমকালের পাঠক কীভাবে কবিকে গ্রহণ করবেন, যা কবির কাব্যবৈশিষ্ট্য নিয়ে পাঠককে সজাগ করার ক্ষেত্রে বা শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে অনেকখানি সাহায্য করেছে।

যে রচনায় বুদ্ধদেব বলেছেন যে, পাঠককে তৈরী করার কাজ সমকালের সাহিত্যিক ও সম্পাদকদের, সেই উপলব্ধিটি আজীবন ভিতরে লালন করেছিলেন তিনি, তাই কবিতার পাতা ওল্টাতে দেখা যায় বিচক্ষণ সম্পাদক বুদ্ধদেব কী ভয়ানক নিষ্ঠায় কবিতার আলোচনা বা কবিতা বিষয়ক গদ্য লিখেছেন। এই সমস্ত রচনার ভিতর দিয়ে পাঠকের চোখের সামনে উদঘাটিত হয় সমকালের সাহিত্যের বিশ্লেষন, পাঠক চিনতে শেখেন এবং সর্বোপরি পাঠক বুঝতে পারেন কীভাবে কবিতাকে গ্রহণ করতে হয়। বোধের জন্ম তৈরীর করার ক্ষেত্রে এই কাজটি সম্পাদক বুদ্ধদেব যথাযথ পালন করেছেন। তার নমুনা পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে 'কবিতা' পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলোতে। সম্পাদনা মানে নিছক কবিতা, গদ্য ছাপানোর নির্বাচন করা, এইটুকু স্থলতার মধ্যে আটকে ছিলেন না বুদ্ধদেব

বসু। সমকালের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারার একটা প্রবল ক্ষমতা ছিল বলেই 'প্রগতি'র সময় থেকে সমস্ত রকম বিদ্রুপ, ব্যঙ্গ, মতপার্থক্য সহ্য করেও তিনি দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে অবিচল ছিলেন 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদনায়।

'কবিতা' পত্রিকা যখন ১৯৩৫ -এ আত্মপ্রকাশ করে তখন কৃত্তিবাসের কবিকূলের ভূমিষ্ঠ হওয়া এবং 'কবিতা' পত্রিকার সঙ্গেই তাদের বেড়ে ওঠা। ফলে কৃত্তিবাসের কবিকুল বলে যারা বিবেচিত, তখন তারা উদ্দীপ্ত তরুণ হয়ে নতুন আত্মপ্রকাশের চেষ্টায় স্বতন্ত্রতা নিয়ে এগিয়ে আসছেন, এবং তাদের অভিভাবকরূপে দেখা যায় বুদ্ধদেব বসুকে। অবশ্য তরুণের মেজাজে অনেকেই তখন বুদ্ধদেবের 'কবিতা'য় একবার লিখে আর লেখেননি কারণ বুদ্ধদেব তরুণদের কবিতা প্রয়োজনে কুঠার দিয়ে অদল - বদল ঘটিয়ে ছাপতে দিতেন এবং এই নিয়ে দূরত্বও তৈরী হয় কারও কারও সঙ্গে। কিন্তু পরিণত বয়সে সবাই স্বীকার করেছেন সঠিক সম্পাদক হিসাবে বুদ্ধদেব সেই সময়ে যথার্থ কাজই করেছিলেন।

তরুণ প্রজন্মের লেখকদের সঙ্গে বুদ্ধদেবের মতপার্থক্য একটা তৈরী হয়েছিল। একদল তরুণ কবি নিজেদের দল তৈরী করে 'কৃত্তিবাস' বলে একটি পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটায় ১৯৫৩ সালে। 'কৃত্তিবাস' এর কেন্দ্রবিন্দু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং একই সঙ্গে দেখা গেল শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার, আনন্দ বাগচী, উৎপলকুমার বসু প্রমুখদের যারা আবার নতুনভাবে কিছু একটা করার তাড়নায় 'কৃত্তিবাস'কে কেন্দ্র করে এগিয়ে এলেন। যদিও শঙ্খ ঘোষ কৃত্তিবাস -এ লিখেছেন তবু তিনি কৃত্তিবাসী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

'কবিতা' পত্রিকা এতদিন প্রতিষ্ঠিত এবং বাংলা সাহিত্যে প্রধানতম কবিতা পত্রিকা বলে বিবেচিত। 'কবিতা' পত্রিকায়— লেখা ওঠা মানে তরুণ কবিদের কবিতার পরীক্ষায় পাস করার মতো। 'কবিতা' পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হওয়াটাই ছিল আনন্দের উৎসাহের, সর্বোপরি সেই কবিতাটি বুদ্ধদেব বসু দ্বারা বিবেচিত মানে ধরে নেওয়া হতো কবিতাটি যথার্থ অর্থেই কবিতা হয়ে উঠেছে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখদের 'কবিতা' পত্রিকায় লেখা প্রকাশ নিয়ে যে অভিমত তা প্রমাণ করে সম্পাদক হিসেবে বুদ্ধদেব বসু কতখানি কৃতিত্ব ও সাফল্যের স্তরে পৌঁছেছিলেন। শ্রদ্ধেয় শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতাই ছাপা হয়, বুদ্ধদেব তাঁর কবিতা একটু পরিমার্জনা করেছিলেন বলে তিনি আর অভিমানে লেখেননি। শঙ্খ ঘোষ বলেছেন : 'কবিতা'য় যে আর লিখিনি, এ নিয়ে অবশ্য আমার বিন্দুমাত্র আক্ষেপ হয়নি কখনো। কিন্তু আজ পর্যন্ত আক্ষেপ হয় এই ভেবে যে, নির্বোধের মতো বুদ্ধদেবের সান্নিধ্য থেকে অকারণে নিজেকে বঞ্চিত করেছি'।

'কৃত্তিবাস' পত্রিকার কবিদের কাছে 'কবিতা' পত্রিকা ছিল ভীষন শ্রদ্ধার। 'কবিতা' প্রকাশকালীনই মারা যান জীবনানন্দ দাশ। 'কবিতা'র প্রকাশসীমার ভিতরেই পরস্পরের কবিতার আগ্রহী আরেকজন সুধীন্দ্রনাথও মারা যান। জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ উভয়কে নিয়েই বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছিল। সমকালের কাছে এবং পরবর্তীকালের কাছেও বুদ্ধদেব বসু ও 'কবিতা' পত্রিকা উল্লেখযোগ্য।

কৃত্তিবাসের কবিকুলের প্রবল দাপটে নতুন ভাবে স্বীকারোক্তি মূলক কবিতা লেখার প্রয়াস দেখা গেল। জীবনটাই উঠে এল কবিতার ভেতর। বুদ্ধদেব যে ভাবে ও দর্শন নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেইখান থেকে কৃত্তিবাসিরা কবিতাকে খানিকটা সরিয়ে এনে নিজেদের কবিতার কাছে প্রতিষ্ঠা করে পাঁচের দশকে নতুন একটা মোড় ঘোরালেন। তাদের কবিতা বুদ্ধদেব বসু নাকি বুঝতে পারছেন না আর। একটা শূন্যতা একটা আক্ষেপ তৈরী হয়। এইভাবে চলতে চলতে ১৯৩৫ থেকে কবিতা পত্রিকা পঁচিশ বছরের পথচলা এসে থামলো ১৯৬১ সালের ২৫তম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায়।

বুদ্ধদেবের পরবর্তী প্রজন্মের কবিরা তাদের কবিতাপত্রে 'কৃত্তিবাস' -এ লিখলেন:-

> কবিতা পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে বলে বুদ্ধদেব বসুর উপর রাগ করতে পারি না। তবু তিনি অন্ততঃ ২৬ বছর চালিয়েছেন। শুধু মনে হয়, প্রথম লিখতে আরম্ভ করার সময় আমরা ভাবতুম যদি কখনো 'কবিতা' পত্রিকায় আমার রচনা ওঠে, তবে জীবন ধন্য হবে। স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতুম 'কবিতা' পত্রিকার দিকে চেয়ে মলাট ওলটাতে সাহস হত না, যদি সূচীপত্রে আমার নাম না দেখি। এখন যারা কবিতা লিখতে শুরু করবেন - তাদের জন্য এই স্বর্গ রইল না। তারা কোন্ কাগজে নিজের লেখা দেখে জীবন ধন্য করবেন? কোনো কাগজ নেই আর।

বোঝা যায় একজন মানুষ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর নিষ্ঠা, শ্রম, বিচক্ষণতা, স্নেহ ও অসম্ভব বোধ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ যে পত্রিকা প্রকাশের পর দীর্ঘ চিঠিতে বুদ্ধদেবকে জানিয়েছিলেন 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যা সম্পর্কিত কথা, সেখানে প্রত্যয় ছিল, স্নেহ, আশীর্বাদ ছিল। আর বন্ধ হয়ে যাবার পর কৃত্তিবাসের সুনীলেরা যা লিখলেন তা পড়ার পর মন বিষাদে ভরে যায়, সত্যি এখনো যদি 'কবিতা' সমান গুরুত্ব নিয়ে প্রকাশিথ হতো! রবীন্দ্রযুগ ও কৃত্তিবাস - যুগের মধ্যবর্তী সময়টায় সংযোগ রেখা ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। এবং তাঁর সময়ে যে জ্যোতিস্ক বলয়ের ভিতর তিনি বিরাজিত তার ভিতরে তিনি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সম্পাদক হিসেবে বিবেচিত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যুদ্ধের প্রবহমানতায় এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্ম ছিনিয়ে নেয় এগিয়ে চলার দায়িত্ব ও যুগের পতাকা। বুদ্ধদেব বসু কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তাঁর স্বতন্ত্র অনায়াস যাতায়াত। তিনি সফল অনুবাদক। বহুমুখী এই মানুষটির শতবর্ষের আলোয় তাঁর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সঠিক আলোচনা, বইপ্রকাশ, মূল্যায়ন হওয়া দরকার।

ভাবতে অবাক লাগে বাঙলা সাহিত্যে এ রকম একজন মানুষ জন্মেছিলেন যিনি হিংসা, খ্যাতি, মতভেদ সব তুচ্ছ করে ভালো কবিতার জন্যে সমস্ত কিছু ছুঁড়ে ফেলে বুকে টেনে নিয়েছেন অনুজ ও সমকালের কবিদের যিনি রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করেছেন নিজের মতো করে।

'প্রগতি' (১৯২৭), 'কবিতা' (১৯৩৫) ছাড়াও বুদ্ধদেব বসু সম্পাদক ছিলেন 'চতুরঙ্গ (১৯৬৮) পত্রিকায় যুগ্মভাবে হুমায়ুন কবিদের সঙ্গে। 'বৈশাখী' (১৯৪১) বার্ষিকীর প্রথম দিকের সম্পাদক ছিলেন তিনি অজিত দত্ত ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। পরে নীহারঞ্জন রায়, জ্যোর্তিময় রায়ের সঙ্গেও।

বাংলা পত্র - পত্রিকা জগতে 'কবিতা' পত্রিকা ম্লান হবার নয়। বুদ্ধদেব বসুর শতবর্ষ পেরিয়ে যাবার পরও তাঁর স্বপ্নের 'প্রগতি' যৌবনের 'কবিতা' বাঙালি পাঠকের ঐতিহ্য অনুসন্ধানের সঙ্গেই ফিরে ফিরে আসার বারবার। যখনই কেউ কবিতা লিখতে আসুক না, তখন তাকে ফিরে ফিরে যেতেই হবে বুদ্ধদেব বসু নামের প্রবাদপ্রতিম মানুষটির কাছে। এই অধমের তাঁর প্রতি শতবর্ষের প্রণাম।

ঋণ স্বীকার

গৌতম ভট্টাচার্য/ বুদ্ধদেব বসু অজিত দত্ত ও প্রগতি

সুবীর রায়চৌধুরী/ কবিতাও সে যুগের লেখকসমাজ সুদক্ষিণা ঘোষ/ মোর আপনারে আমি...

বুদ্ধদেব রচনাবলী

কবিতা পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা

প্রভাতকুমার দাস/ কবিতা পত্রিকার সূচিগত ইতিহাস।